BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

ইহুদী সম্প্রদায়ের মতিগতি

মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

ইহুদীরাই মানবতার সবচেয়ে জঘন্য দুশমন বলে বিবেচিত। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি, বিশ্ব মানবতার প্রতি তাদের আচরণ মোটেই মানবিক ও বন্ধুসুলভ নয়। এই ইহুদীরা এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত খ্রীস্টান, পৌত্তলিক, কমুনিষ্ট ও মুনাফিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, সেসবের ব্যাপারে আমাদের প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে। তাই আমরা কুরআনের আলোকে তাদের স্বভাব-চরিত্র, আচরণ, ষড়যন্ত্র ও তৎপরতার ব্যাপারে পাঠকদের কিঞ্চিত ধারণা দেয়ার প্রয়াস চালাবো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর তার প্রতি এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি; আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসেক। বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট প্রতিদানের সংবাদ দেব? যাদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন, যাদেরকে তিনি গযব দিয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাগূতের এবাদত করেছে; তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলেঃ আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ তা খুব জানেন। আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালংঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্য তাদেরকে অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হাতই উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-মায়েদাহঃ ৫৯-৬৪)

এখানে প্রথমে উদ্ধৃত ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ইহুদীদের কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন যে, তোমরা শত্রুতা করার মত এছাড়া আর কি কারণ আমাদের মাঝে দেখতে পাচছ যে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং সেই সাথে তিনি বর্তমানে ও পূর্বে যা কিছু নাযিল করেছেন, তা সবই মেনে নিয়েছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদল ইহুদী লোক নবী করীমের (সাঃ) কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "হে মুহাম্মদ! তুমি কোন কোন রাসূলের প্রতি অথবা কোন কোন বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখ?" তখন নবী করীম (সাঃ) উত্তর দিলেন, "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণ তাঁদের রবের পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।" (সূরা আল-ইমরানঃ৮৪) একথা শুনে ইহুদীরা বলল, "আমরা ঈসার প্রতি ঈমান রাখি না এবং নবী বলে তাকে স্বীকারও করি না। আর যে লোক তার প্রতি ঈমান আনে, তাকেও আমরা নবীরূপে মানি না।" এর জবাবে আলোচ্য আয়াতে আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তবে কি আমাদের আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী ও কিতাব মেনে নেয়াটাই তোমাদের শত্রুতার কারণ? তোমাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করাটাই কি আমাদের অপরাধ? আমাদের ধর্মের মধ্যে এমন কি দোষ-ত্রুটি পেলে যার দ্বারা তোমরা আমাদেরকে দোষারোপ করছ? আসল ব্যাপার হল তোমরা নিজেরাই অপরাধী ও দুশ্চরিত্র। এ আয়াতে মুমিনদের সাথে ইহুদীদের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ইহুদীদের ভ্রষ্টতা প্রমাণের পর পরবর্তী ৬০ নং আয়াতে সেই ইহুদীদের মধ্যেও যারা সবচেয়ে অধিক নিকৃষ্ট তাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এবং তারাই যে আল্লাহর কাছে মন্দ প্রতিফল লাভের ব্যাপারে সকলের চেয়ে অধিক উপযোগী সেকথা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ইহুদীরা যে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র দাবি করত, পার্থিব ও পারলৌকিক যাবতীয় উত্তম প্রতিদানকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বলে গণ্য করত, বংশগত অহঙ্কারের কারণে নিজেদেরকে সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর মুসলমানদের হেয়জ্ঞান করত এবং একমাত্র নিজেদেরকেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রচার করত; সেই দাবিগুলো খণ্ডনের জন্যই আলোচ্য আয়াতে তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন বরং ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট; তারা মানবজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রতিদান লাভের অধিকারী নয়, বরং সকল মানুষের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতে তারাই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিদান লাভ করবে; তারা মর্যাদায় মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং পশু ও শয়তানের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তারা সত্যের পথেও নেই, বরং সরল সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তাদের প্রতি কেবল অভিসম্পাতের ঘোষণাই দেয়া হয়নি, বরং বাস্তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের মাধ্যমে আল্লাহর গযব তথা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে-- কাউকে বানর আবার কাউকে শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আত্মগর্বে মদমত্ত বর্ণবাদী ইহুদীরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে মানুষ মনে করে না, অথচ তারা নিজেরাই অমানুষ। তাদের একদলকে পশুর আকৃতি দান করে এ সত্যটিকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। পশুর মর্যাদা যে মানুষের চেয়ে নিচে এবং বানর ও শূকরের অবস্থান যে পশুদের মধ্যেও সবচেয়ে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত তা সকলেই জানে। ইহুদীদের লাঞ্ছনার আরো একটি নিদর্শন হল তাগূতের এবাদতে লিপ্ত হওয়া। তাগূতের এবাদত বলতে শয়তানের আনুগত্য, দেব-দেবীর পূজা কিংবা আল্লাহদ্রোহী মানুষের গোলামী করা বুঝায়। এককথায়, যা কিছু আল্লাহবিরোধী, যা কিছু মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তাই তাগূত এবং তার এবাদতই তাগূতের এবাদত। ইহুদীদের এসব ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেননি এবং এমন কোন শ্রেষ্ঠত্বও দান করেননি যার জোরে তারা আখেরী নবী (সাঃ) ও তাঁর উম্মতদের উপহাস করতে পারে। তাদের ঐতিহাসিক দুরবস্থার বিচারে তাদের সম্পর্কে বরং এটাই রায় দেয়া যায় যে, তারা মর্যাদার ক্ষেত্রে যেমন নিকৃষ্ট, তেমনি সত্যপথ থেকেও বিচ্যুত। তারা আল্লাহর কাছে সম্মানিত কোন জাতি নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও শয়তান কর্তৃক গৃহীত এক সম্প্রদায়। আয়াতে ইহুদীদের উদ্দেশ্যে যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে, তোমরা এমন লোকদের উত্তরসূরী যারা আল্লাহর অভিশাপে সকল মান-মর্যাদা হারিয়ে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে। একটি নির্দিষ্ট বংশের মানুষ হলেই যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি আর উচ্চ মর্যাদা রিজার্ভ হয়ে যেত, তাহলে তোমাদের ঐ সমস্ত পূর্বপুরুষদের এমন দশা হতো না। অতএব, বংশগত কৌলীন্যের ভিত্তিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা আর অন্যদের হেয়

মনে করা তোমাদের পক্ষে শোভা পায় না। তারা এমন ভাব দেখায় যেন তারা নিজেরাই সম্মানিত ও সুপথপ্রাপ্ত, আর মুসলমানরাই লাঞ্ছিত ও বিপথগামী বলে তারা মুসলমানদের ঘৃণা করে। অথচ বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বরং নিজেরা সত্য-সরল পথ থেকে দূরে অবস্থান করছে বলেই যারা সত্যিকারভাবে সরল পথে আছে তাদেরকে উপহাসের দৃষ্টিতে দেখে। ৬০ নং আয়াতে ইহুদীদের অতীত দুরবস্থা বর্ণনার পর পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের বর্তমান নৈতিক ও চারিত্রিক দেউলিয়াপনার বিবরণ দিয়ে তাদের নীচতা ও বিপথগামিতাকেই আরো অধিক জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যে নিজেদের পূর্বপুরুষদের মতই লাঞ্ছনা-অপমানের যোগ্য এবং ভ্রান্ত পথের পথিক, সেটাই প্রমাণ করা হয়েছে। ৬১ নং আয়াতে তাদের মুনাফেকি, ৬২ নং আয়াতে পাপাচার, ৬৩ নং আয়াতে তাদের আলেম সমাজের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা এবং ৬৪ নং আয়াতে ইহুদীদের প্রকাশ্য খোদাদ্রোহিতা ও ফেতনাবাজির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ৬১ নং আয়াতে তাদের যে মুনাফেকির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাহল, তারা আমাদের কাছে এসে ঈমানের ঘোষণা দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা কুফর নিয়েই আসে এবং কুফর নিয়েই ফিরে যায়। হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে প্রবেশ করে ঈমানগ্রহণ এবং আল্লাহর তরফ হতে তিনি যে নির্দেশ লাভ করেছেন তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়ার কথা জানাল। অথচ তারা অন্তরে কুফরী ও ভ্রষ্টতাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রেখেছিল; কিন্তু বাহ্যিকভাবে ঈমান আনার কথা প্রকাশ করছিল। তখন আল্লাহ তাদের অন্তরে কুফরী প্রতিপালন এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা অবগতির জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। (আনওয়ারুত তানযীল) এ থেকে বোঝা গেল, ইহুদীরা আমাদের সামনে ঈমানদারের ন্যায় আচরণ করে, কিন্তু অন্তরে কুফরী ভাব বজায় রাখে। তারা যখন আমাদের কাছে আসে অথবা আমরা যখন তাদের কাছে যাই, তখন তারা কথায় ও কাজে ঈমানদারীর বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, আর আমাদের চক্ষু ও কর্ণের অগোচরে আবার কুফরী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মুসলিম জনগণের মধ্যেও কিছুসংখ্যক লোক ছিল যারা ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়েও মুসলমানদের কাছে এসে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত, যারা মুনাফিক নামে পরিচিত। ইহুদী ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের কথাবার্তা, কার্যকলাপ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কলাকৌশল, চিন্তা-চেতনা সব ছিল একই রকমের এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধন ও ধোঁকাদানের ক্ষেত্রে তারা ছিল পরস্পর সহযোগী। এদের সম্পর্কে আল কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি-- আমরা তো উপহাস করি মাত্র।" (সূরা বাকারা) সূরা মায়েদার ৬২ নং আয়াতে ইহুদীদের পাপ, সীমালঙ্ঘন ও হারাম ভক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আত-তীনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করি, তারপর তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেই।" ইহুদীদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ এটা আক্ষরিকভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তাদের উত্তরসূরীরাও সেই পশুর স্তর থেকে উঠে আসতে পারেনি, বরং আরো অধিক দ্রুতগতিতে পাশবিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।" (সূরা আল-ফুরকানঃ৪৩,৪৪) অর্থাৎ, মানুষ যখন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও বিপথগামী হয়, তখন যেকোন ধরনের পাপ ও অন্যায় কাজ করতে তাদের বিবেকে বাধে না। নরপশুরা যাবতীয় অপরাধমূলক কাজের দিকে দৌড়ে দৌড়ে অগ্রসর হয়, তাদের এ অগ্রযাত্রার গন্তব্যের কোন শেষ নেই, তাদের দৌড় কোন নির্দিষ্ট সীমানায় গিয়ে থেমে থাকে না, বরং প্রতিদিন এমন সব নিত্য নতুন রেকর্ড উপহার দিতে থাকে যা তাদের পূর্ববর্তী কীর্তিকে ম্লান করে দেয়। যারা জঘন্যতম পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে রেকর্ড সৃষ্টির প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং যেসব নেতা-নেত্রী এদের প্রোটেকশন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে, তারা যেকোন বিচারেই মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম-- তারা যতই নিজেদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করুক না কেন। এমন লোকেরা ইহুদীদের মধ্যে হোক, অথবা যেকোন জাতির মধ্যে হোক, তাদের সকলের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। ৬৩ নং আয়াতে ইহুদী আলেমদের কাছে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, তারা কেন স্বজাতির লোকদের অশ্লীল কথাবার্তা ও হারাম ভক্ষণের কোন প্রতিবাদ করে না? অথচ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাটা সাধারণভাবে সকলের এবং বিশেষভাবে আলেম সমাজের এক অপরিহার্য দায়িত্ব। ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদধারণার ভয়ে তাদের মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। হাদীসে আছে, "বনী ইসরাইলের মধ্যে প্রথমে এভাবে দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারিতা অনুপ্রবেশ করে যে, তারা যখন পাপ কাজে লিপ্ত হল, তাদের আলেমগণ তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকতে বলল, কিন্তু তারা বিরত হল না। আলেমগণ তাদের সাথে উঠা-বসা ও পানাহার করতে থাকল। অতঃপর আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিলেন।" এ থেকে আমরা শিক্ষা পাই, আলেম সমাজের কর্তব্য হল তারা মানুষকে সংশোধনের চেষ্টা করবে, তারপর সংশোধন না হলে অপরাধীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। মালেক ইবনে দীনার বলেনঃ আল্লাহ তাআলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরয করলেন, এ বস্তিতে আপনার অমুক এবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও-- আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনো ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি। হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী এসেছিল যে, "আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে ৪০ হাজার সৎ লোক এবং ৬০ হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আঃ) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এলঃ এ সৎলোকগুলোও অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনো তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি।" এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একটা জাতির সৎ লোক তথা আলেমগণের দায়িত্বহীনতা ও কাপুরুষতা গোটা জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হয়। যেখানে মানুষের একে অপরকে ব্যক্তিগত পাপ থেকে বিরত রাখতে অবহেলা করা এবং সেই সমস্ত পাপীদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা এতবড় ক্ষতির কারণ, সেখানে মানুষকে ছলে-বলে-কৌশলে পাপের পথে পরিচালিত করবার প্রয়াসকে বরদাশত করার খেসারত যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। যারা কেবল নিজেরা পাপ কথা বলে ও হারাম ভক্ষণ করে, তাদেরকে নিষেধ না করাটাই যেখানে আল্লাহর কাছে তিরস্কারযোগ্য অপরাধ, সেখানে যারা মানুষকে জোরপূর্বক পাপ কথা শিখায় ও হারাম ভক্ষণ করায়, তাদেরকে কোনরূপ বাধাদান থেকে বিরত থাকাটা নিঃসন্দেহে আরো অধিক গুরুতর ব্যাপার। আল-কুরআনে অন্যত্র সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ প্রসঙ্গে পুত্রের প্রতি হযরত লুকমান (আঃ)-এর উপদেশ বর্ণনা করা হয়েছে, "ভাল কাজের আদেশ দান কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর। আর তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে সবর কর। মনে রেখো, এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত উঁচুদরের সাহসিকতা ও বীরত্বের কাজ।" (লুকমান) এ আয়াতের আলোচনায় মাওলানা আবদুর রহীম বলেন, "আমর বিল মারূফ ও নিহী আনিল মুনকার-এর নির্দেশের পরই ধৈর্য অবলম্বন করতে বলা হয়েছে সেই

বিপদে, যা তোমার উপর ঘনিয়ে আসবে। এ থেকে বোঝা যায়, এ কাজটাই এমন যে, এর ফলে এই কাজ যারাই করবে তাদের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসা যেমন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, তেমনি নয় কিছু মাত্র অসম্ভবও। অন্যথায় এখানে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়ার কোন সঙ্গতি থাকে না।" আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, মন্দ কাজের দিকে আহবান জানানো এবং ভাল কাজ থেকে বারণ করার ক্ষেত্রে সাধারণত কাউকে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না। এক্ষেত্রে বরং অধিকাংশ মানুষের সমর্থনই পাওয়া যায়। এমনকি কেউ যখন জোরপূর্বক মানুষকে সত্যের পথ থেকে সরিয়ে মিথ্যার পথে নিয়ে যেতে চায় এবং মিথ্যা চাপিয়ে দেয়ার জন্য সীমাহীন নির্যাতনের আশ্রয় নেয়, তখনো বেশির ভাগ মানুষ কোন বাদ-প্রতিবাদে জড়ানোর পরিবর্তে মৌনতা অবলম্বনকেই শ্রেয়জ্ঞান করে। এমতাবস্থায় কেউ যদি জালেমের জুলুমকে প্রতিরোধ ও মজলুমকে রক্ষা করতে চায়, তাকেই সবাই মিলে কোণঠাসা করে রাখবে। শুধু জালেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই নয়, মজলুমদেরকে সত্যের শিক্ষা দান করা কিংবা তাদের সাথে ন্যূনতম স্বাভাবিক ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখতে চাওয়াটাও মহা অপরাধ হয়ে দাড়ায়। এ কারণেই সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের এ কাজকে সাহসিকতার কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যা কেবল ধৈর্য্যশীলদের পক্ষেই সম্ভব। যারা নিজেরা যাবতীয় অন্যায়কে পরিহার করে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সাধ্যমত সত্যের সমর্থন ও অন্যায়ের বিরোধিতা করে যাবে, তারাই আল্লাহর কাছে রহমতপ্রাপ্ত ও সম্মানিত হবে। পক্ষান্তরে যারা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের জীবনে বাতিলকে গ্রহণ করবে এবং সমাজের উপর বাতিলের প্রভাবকে নির্বিবাদে মেনে নেবে, তারাই আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। নিজেরা লাগামহীনভাবে অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া এবং অন্যান্যদেরকেও স্বাধীনভাবে অন্যায় কাজ করে যাওয়ার সুযোগ প্রদানের কারণেই ইহুদীরা দুরবস্থা ও অভিশপ্ত দশায় নিপতিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।" (মায়েদাঃ৭৮,৭৯)

সূরা মায়েদার ৬৪ নং আয়াতের শুরুর দিকে প্রথমে আল্লাহর বিরুদ্ধে ইহুদীদের একটি উক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর ইহুদীদের দায়ী হবার কথা প্রমাণ করা হয়েছে এবং পরিশেষে আল্লাহর নির্দোষিতা ও হেকমতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে ইহুদীদের বক্তব্য খণ্ডনের পর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণীর কারণে তাদের অনেকের বিদ্রোহ ও কুফর আরো বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াত যত বেশী শুনানো হবে, তারা তত বেশী বিরোধিতাই করবে। ফলে তাদের কুফরীর মাত্রাই বাড়বে। আল্লাহর কিতাবের বর্ণনা থেকে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও নির্দোষিতা প্রমাণ হওয়া এবং তা আল্লাহ সম্পর্কে যাবতীয় কুধারণা নিরসনে যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এতে আল্লাহর এই শত্রুদের শত্রুতা এতটুকু কমবে না, বরং খোদাদ্রোহিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ বলেন, "আমি কুরআনে যা নাযিল করি তা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত, আর জালেমদের জন্য তা খেসারত ছাড়া আর কিছুই বাড়ায় না।" (বনী ইসরাইলঃ৮২) অর্থাৎ, যারা ঈমানদার, তারা কুরআনের আয়াতের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক সকল দিক দিয়েই উপকৃত হয়, মন ও মস্তিষ্ক আরো সতেজ ও শান্তিময় হয়। পক্ষান্তরে জালেম, অপরাধী ও বেঈমানদের কুরআন শুনলেই মাথা নষ্ট হয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ মুমিনদের মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন দুনিয়া ও আখেরাতে। এবং জালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (সূরা ইবরাহীমঃ২৭) অর্থাৎ, আল্লাহ কুরআনের দ্বারা মুমিনদের প্রশান্তি ও মনোবল বৃদ্ধি করেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় যুক্তিতর্কে মনস্তাত্বিক বিজয় দান করেন। আর কাফেরদের জব্দ ও পরাজিত করে তাদের অন্তরে প্রতিহিংসা সৃষ্টির দ্বারা গোমরাহির মাত্রা বাড়িয়ে দেন। একদল মুনাফিকের বিদ্রূপাত্মক আচরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, "আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করল? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান আসলেই বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুত যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করল।" (সূরা তওবাঃ১২৪,১২৫) অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, "যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তুমি কাফেরদের চোখে-মুখে অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে ওঠে।" (সূরা হজ্জ) যারা কাফের, তারা সরাসরি কুরআন তেলাওয়াতের জন্যই মারধোর করে। আর যারা মুনাফিক, তারা কুরআন তেলাওয়াত শুনে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয় এবং পরে সুযোগ বুঝে অপর কোন উছিলায় সেই ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আল্লাহর কালামের প্রতি কাফেরদের আচরণ প্রসঙ্গে তাদের একটি উক্তি ও কর্মপদ্ধতি এবং তার পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে, "আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলসরূপ। কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।" (সূরা হামীম সেজদাহঃ২৬-২৯) কাফেররা প্রকাশ্যে হৈ চৈ করে মানুষের কুরআন শুনায় বিঘ্ন ঘটায়, আর মুনাফিকরা সরাসরি নিজের গলা দিয়ে চিৎকার না করে বরং আমাদেরকেই খেলাধূলা বা অন্য কোন গোলমালের মাঝে ডুবিয়ে দেয়। মানুষকে কুরআন শিক্ষা থেকে দূরে রাখার জন্য নানা অযুহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনেক সময় কুরআন প্রচারকারীদের ব্যক্তিগত চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের মাধ্যমেও হট্টগোল সৃষ্টি করা হয়। প্রয়োজনে খুন-খারাবি ঘটিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টির দ্বারাও কুরআন শিক্ষার কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার বন্দোবস্ত করে। সরাসরি বাধাদানের হিম্মত না থাকায় ভিন্ন কোন ইস্যুতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কুরআন ও নামাজে বিঘ্ন ঘটায়। কাফেরদের কথামত যারা কুরআনকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তারাও সেই কাফেরদের সাথে জাহান্নামের সহযাত্রী হবে। সেদিন আদেশ পালনকারী কাফেররা আদেশদাতা কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, এরাই আমাদের কুরআন শুনতে বারণ করত এবং কুরআন প্রচারের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টির নির্দেশ দিত। এভাবে কুরআনের বিরোধিতাই তাদের দুনিয়ায় বিপথগামিতা ও আখেরাতে আযাবের কারণ হয়ে দাড়ায়। ইহুদী-খ্রীস্টানরা ক্ষেত্রবিশেষে ইসলামকে ঘায়েল করার ন্যায় কুফরী কাজেও কুরআনকে ব্যবহার করতে পারে। তাদের মিশনারীরা নিজেদের মূল পরিচয় ঢেকে রেখে মুসলিম সমাজে গুপ্তচরবৃত্তি করা এবং কুরআন থেকে আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ সব জেনে নিয়ে মানুষকে আল্লাহর মর্জির বিপরীতে চালানোর উদ্দেশ্যে নিজেরা উত্তমরূপে কুরআন শিখে নেয়। ফলে আল্লাহর কালাম তাদের জন্য ঈমানের পথে আসতে সহায়ক হবার পরিবর্তে তাদের কুফরী মিশনেই কেবল গতি সঞ্চার করে। আল্লাহর আয়াত শোনা বা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানার ফলে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, নামায-রোযা, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রতিহিংসা এতই বেড়ে যায় যে, তা আর নীতিগত বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সর্বাত্মক শত্রুতায় রূপ নেয়। আল্লাহর কালামের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং আল্লাহর এবাদত ও হুকুম পালনের প্রতি আমাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে তারা আমাদের দ্বীনকে প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য আরো অধিক পেরেশান হয়ে ওঠে, সার্বক্ষণিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়।

সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে এরপর আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও ক্রোধ সঞ্চার করে দিয়েছেন। এখানে "তাদের মধ্যে" বলতে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মধ্যে কিংবা ইহুদী সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে দুটোই বোঝানো হতে পারে। আল্লাহ আরো বলেছেন যে, তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, তিনি তখনই তা নিভিয়ে দেন। অর্থাৎ যখন তারা যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়েছে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মতভেদ, ভাঙ্গন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন বিধায় তারা তাদের যুদ্ধোন্মাদনা চরিতার্থ করতে পারেনি। এমনি করে তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে থাকবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এই আগুন নির্বাপিত করতে থাকবেন। কোন কোন তাফসীরবিদ এখানে আগুন অর্থ রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যখনই তাদের অন্তরে হিংসা ও ক্ষোভের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি অনুপ্রবেশ করিয়ে সেই আগুন নির্বাপিত করেছেন। ইহুদীদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন, কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন।" (সূরা হাশর) অর্থাৎ, তাদের নিজেদের মধ্যে যেমন মতবিরোধ রয়েছে, তেমনি প্রত্যেকের মনের ভিতরেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে। মুসলমানদের হত্যা করবে, নাকি ধর্মান্তর করবে; নিজের মনের শত্রুতা প্রকাশ করবে, নাকি গোপন রাখবে; প্রকাশ্যে আক্রমণ চালাবে, নাকি গোপনে অনিষ্ট করবে ইত্যাদি ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে। ইসলামের শত্রুরা যুদ্ধের আগুন যেমন নিজেরা ঐক্যবদ্ধভাবে জ্বালানোর চেষ্টা করে, তেমনি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমেও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং বিবদমান পক্ষগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে সেই আগুনে ইন্ধন যোগায়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মাঝে ধৈর্য্য, সহনশীলতা পয়দা করার মাধ্যমে আল্লাহ সেই আগুন নিভিয়ে দেন।

পরিশেষে ইহুদীদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, তারা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে যত ফেতনা-ফাসাদ ও অশান্তি বিরাজ করতে দেখা যায়, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার প্রায় প্রত্যেক জায়গায় অশান্তির পিছনে ইহুদীদের কোন না কোন কারসাজি বিদ্যমান রয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষে মানুষে শত্রুতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি করাই ইহুদীদের কাজ। তারা মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের, একদল মুসলমানের সাথে আরেকদল মুসলমানের কিংবা অমুসলিমদের মধ্যেই এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের বিভেদ সৃষ্টি করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিরই অকল্যাণ সাধনে মেতে থাকে। ইহুদীরা যেহেতু আল্লাহর শত্রু, তাই আল্লাহর বান্দা তথা মানুষ মাত্রই তাদের শত্রুতার পাত্র। এজন্য মানুষের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির দ্বারা মানুষের আবাসভূমি পৃথিবীটাকে জাহান্নামে পরিণত করে সকল মানুষকে জাহান্নামের দহন যন্ত্রণা ভোগ করাতে পারলেই তারা ধন্য। এতদুদ্দেশ্যে তারা এক জাতিকে আরেক জাতির বিরুদ্ধে, এক ধর্মের মানুষকে আরেক ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে, এক দেশকে আরেক দেশের বিরুদ্ধে, এক দলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে, এক বংশ-গোত্রকে আরেক বংশ-গোত্রের বিরুদ্ধে, এক পরিবারকে আরেক পরিবারের বিরুদ্ধে এবং এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। তারা এক পক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতা চালিয়ে তার দায়দায়িত্ব যাতে অন্য পক্ষের উপর পড়ে সেই ব্যবস্থা করে এবং এভাবে উভয় পক্ষকে পারস্পরিক হানাহানির মাঝে লিপ্ত করে দেয়। ইহুদীরা সর্বত্র ফেতনা-ফাসাদের বিষবাষ্প ছড়ালেও নিজেরা তাতে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে, মানুষে মানুষে হানাহানি বাধিয়ে দিয়ে নিজেরা বসে বসে তামাশা দেখে। আজ ইহুদীদের প্রেসক্রিপশন অনুসারে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ক্রুসেডের সূত্রপাত হয়েছে, সেই ক্রুসেডে মুসলমানদেরকেই অংশগ্রহণের আহবান জানানো হয়েছিল এই বলে যে, যেহেতু এই অভিযানে ইসরাইলকে সাথে নেয়া হচ্ছে না, সেহেতু এ লড়াই ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। এতে করে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, ইসরাইল ইসলামের শত্রু। তাহলে যারা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে এবং মুসলমানদের মোকাবেলায় সর্বদা ইসরাইলের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা বজায় রাখছে, তারা কি ইসলামের বন্ধু? ইসরাইলের প্ররোচনায়, ইহুদীদের ইচ্ছা ও বাসনা অনুসারে যে কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যে কাজটি করা হচ্ছে ইহুদীবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ এবং বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করার ইহুদীবাদী চক্রান্তই যার পিছনে কাজ করছে, সে কাজটিতে ইসরাইল সরাসরি জড়িত না হওয়াটাই কি কাজটিকে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ এবং বিশ্বশান্তির জন্য অনুকূল প্রমাণে যথেষ্ট? কাজটি স্বয়ং ইহুদীদের, ব্যবহার করা হবে মুসলমানদের, রক্ত দেবে মুসলমানরা, বাস্তবায়িত হবে ইহুদীদের মিশন। ফাসাদ সৃষ্টি করবে ইহুদীরা, দোষ হবে মুসলমানদের, ব্যবস্থা নেয়া হবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, আর এতে অংশও নিতে হবে মুসলমানদের। পক্ষান্তরে ইহুদীরা দোষ থেকে যেমন অব্যাহতি পাবে, কথিত দোষীদের দমনে অংশ নেয়ার ঝামেলা থেকেও অব্যাহতি পাবে। ফাসাদের জন্মদাতা হয়েও সেই ফাসাদের কোন ধাক্কা তাদেরকে সামলাতে হবে না, বরং তারা থাকবে সম্পূর্ণ শান্তিতে ও নিরাপদে। ইহুদীদের সৃষ্ট ফাসাদের শিকার ও ভিকটিম হবে সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষেরা এবং বিশেষভাবে মুসলমানরা, আর সেই ফাসাদের বেনিফিশিয়ারী হবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ইহুদীরা। শুধু তাই নয়, ইহুদীদের সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ যেন ইহুদী রাষ্ট্রের উপর প্রতিশোধ নিতে না পারে, সেজন্যও মুসলিম দেশগুলোকে অগ্রিম শাসিয়ে দেয় ইহুদী প্রভাবিত বিশ্ব নেতারা। ইহুদীরা কেবল নিজেরা চক্রান্ত ও ফাসাদ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং কথামালা ও প্রোপাগান্ডার জোরে অন্যদেরকেই চক্রান্তকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদেরকে কেবল চক্রান্ত ও ফাসাদের শিকার আর এসবের নিরাময়কারী হিসেবে মানুষের কাছে সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়। ফলে ইহুদীরা অপরাধী হয়েও কোনরকম শাস্তি ভোগ করার পরিবর্তে লাভ করে শান্তি ও নিরাপত্তা। আর মুসলমানদেরকে নিরপরাধ হয়েও ইহুদীদের কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হয়। ইহুদী ও পৌত্তলিকরা মানুষের উপর সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েও মানুষের কাছে এমনভাবে গৃহীত হয় যে, যেন তারা সন্ত্রাসকবলিত মানুষের বিপদে পাশে এসে দাড়িয়েছে। ইহুদীরা একেকটা ফাসাদের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে ঘটানো সত্ত্বেও তার জন্য তাদেরকে পরোক্ষভাবে দায়ী করাকেও তারা সহ্য করতে পারে না। যে সর্বনাশ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সাধন করে, সেই সর্বনাশের পিছনে কেউ তাদেরকে অনিচ্ছাকৃতভাবে দায়ী বললেও তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কেউ কোনপ্রকার ফাসাদের সাথে কোনভাবে জড়িত না হলেও তাকেই সকল ফাসাদের হোতা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার বিরুদ্ধে চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায়। ইহুদীরা তাদের অধিকাংশ ফাসাদের কাজ সূক্ষ্মভাবে গোপনীয়তার সাথেই সম্পন্ন করে থাকে যাতে তাদের সংশ্লিষ্টতার কোন সম্ভাবনা মানুষের গোচরীভূত না হয়। আর কোন কিছু প্রকাশ্যে করলেও কিংবা প্রকাশ পেয়ে গেলেও তারা তার পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন অনিবার্যতা ও উপযোগিতা পেশ করে, যা বিশ্বাস ও গ্রহণ করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

ইহুদীরা তাদের সৃষ্ট ফাসাদের জালে গোটা দুনিয়ার মানুষকে বেষ্টন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে মূলতঃ তাদের অপূর্ব প্রভাবন ক্ষমতার জোরে। একজন ইহুদী নিজে ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বা ক্ষমতাশালী না হলেও সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করার অসাধারণ যোগ্যতা রাখে। কাকে কিভাবে প্রভাবিত করতে হবে তা তারা ভাল করেই জানে। যারা অর্থের প্রতি দুর্বল, তাদেরকে অর্থবিত্তের দ্বারা বশ করে রাখে। যাদের মধ্যে যৌন দুর্বলতা প্রবল, তাদের যৌন অনুভূতিতে সুড়সুড়ি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে এবং তাদের দ্বারা অন্যান্য মানুষকেও ধ্বংসের ব্যবস্থা করে। যাদের মসনদের মোহ আছে, তাদেরকে মসনদ দখলের লড়াইয়ে সহযোগিতা ও সমর্থন যোগায়। যারা ব্যবহারে মুগ্ধ হয়, তাদেরকে মিষ্টি কথা ও আদর-আপ্যায়নের দ্বারা ভুলিয়ে ফেলে। যারা তোষামোদপ্রিয়, তাদেরকে তোষামোদের দ্বারা পটিয়ে ফেলে। যারা খুব বেশি সেনসিটিভ এবং মানুষের কাছে দুর্ব্যবহার পেলে দুঃখে-ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়েন, তাদের বঞ্চনা ও ক্ষোভের অনুভূতিকে উস্কে দিয়ে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কাজে লাগায়। যারা অধিকারবঞ্চিত ও অধিকারসচেতন, তাদের বঞ্চনা ও ক্ষোভের অনুভূতির সাথে একাত্মতা প্রকাশের মাধ্যমে অসন্তোষের আগুনে ইন্ধন যোগায়। যাদের মধ্যে জেদ ও প্রেস্টিজবোধ প্রবল, তাদের সেই জেদ ও আত্মসম্মানবোধকে নাড়া দেয়ার মাধ্যমে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। যারা একটু রিঅ্যাকটিভ ও জেদী স্বভাবের, কোন ব্যাপারে একটু রাগ হলেই সেখান থেকে নিজেরা কেটে পড়েন এবং অন্যদেরকেও সরিয়ে নিয়ে যান, তাদেরকে তিরস্কার ও গালিগালাজের মাধ্যমে উত্তেজিত করে তাদেরকে এবং তাদের দ্বারা অন্যদেরকে ময়দান থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের ফেতনা-ফাসাদের পথকে কন্টকমুক্ত করার ব্যবস্থা করে। যারা অতিশয় নরম-দিল ও সহানুভূতিপ্রবণ, তাদের কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, বঞ্চনা আর অভাব-অভিযোগের কথা বর্ণনা করে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যারা স্বজন, স্বজাতি বা স্বধর্মের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, তাদের সেই সমস্ত আবেগকে নাড়া দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করে। যারা সরলমনা ও কানপাতলা-- যা শোনে তাই বিশ্বাস করে, তাদের কাছে নিজেদের কার্যকলাপের একটা না একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাড় করিয়ে নিবৃত্ত করে রাখে। আর যাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল পায়, তাদেরকে বলপ্রয়োগ ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা হাতের মুঠোয় ধরে রাখে। যারা একটু বেশি আত্মমর্যাদা সচেতন, সর্বাবস্থায় যেকোন মূল্যে কেবল নিজেদের মান-সম্মানটা ধরে রাখতে চান, আর এজন্য সকলের কাছে ভাল থাকতে এবং যেকোন সমালোচকের সমালোচনা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, তাদেরকে নানারূপ নিন্দা-অপবাদ, কটূক্তি ও তিরস্কারের দ্বারা সোজা করে রাখে। যারা স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক, সর্বাবস্থায় নিজের স্বার্থটা সমুন্নত রেখে নিজে ঝামেলামুক্ত থাকতে পছন্দ করেন, তাদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে, জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে তাদের কাছ থেকে নিজেদের দাবী আদায় করে নেয়। যারা বিপদগ্রস্ত ও সমস্যাপীড়িত হওয়ায় সাহায্যের মুখাপেক্ষী, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে, দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের বশীভূত করে নেয়। তারা মানুষের দুঃখ-বিপদে সহানুভূতি ও উদ্বেগ প্রকাশ করে, নিজেরা মানুষের বিপদের সঙ্গী হয় এবং মানুষকে নিজেদের বিপদের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে, যার ফলে মানুষ তাদের সকল শত্রুতামূলক আচরণ ও তৎপরতার কথা ভুলে যায় এবং তাদেরকে আপন ও হিতাকাংক্ষী হিসেবে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি তারা মানুষের ছোট-বড় সকল ব্যাপারে খেয়াল রাখে, খোঁজ-খবর নেয় এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে। এভাবে মানুষের হৃদয়ে এমন স্থান করে নেয় যে, মানুষ তাদের জন্য বা তাদের কথায় প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের দ্বীন-ঈমান ও পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে স্বজাতির ভাইদের পরিত্যাগ করে তাদের পদতলে নিজেদেরকে লুটিয়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা এসব ছলনা-প্রতারণা ও অভিনয়ের দ্বারা মানুষের মগজকে এমনভাবে ধোলাই করে ফেলতে সক্ষম হয় যে, তাদের ভাল আচরণের মন্দ উদ্দেশ্যকে ধরতে পারা তো দূরের কথা, তাদের খারাপ আচরণকেও মানুষ সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। এমনিভাবে মানব সমাজের ছোট-বড় প্রত্যেকটি স্তরে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর ইহুদীবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লাগাম ইহুদীদের হাতে চলে যায়। বিশেষ করে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা ইহুদীদের বশীভূত হওয়া, সেসব দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া ইহুদী পুঁজিপতিদের অর্থ সরবরাহের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বড় বড় সংবাদ মাধ্যম ও মিডিয়া জগত ইহুদীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় গোটা বিশ্বের ক্ষমতার চাবি আজ ইহুদী শক্তির করায়ত্ত। আর এ চাবিকে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই তারা ফাসাদকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে সর্বত্র, তাদের সৃষ্ট অশান্তির আগুনে মানুষের দেশ, সমাজ, পরিবার সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে সমর্থ হয়েছে। এ সাফল্য তারা ঘরে বসে লাভ করেনি। এটা অর্জনের জন্য তারা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে অনুপ্রবেশ করে, দেশে দেশে আর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যখন যে সমাজে, যে পরিবারে বা যে জাতির মধ্যে অবস্থান করে, তখন সেই সমাজ, সেই পরিবার বা সেই জাতির ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-আদর্শ, জীবনধারা ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং তলে তলে সেখানে নিজেদের জীবনাদর্শ ও রীতি-নীতির প্রচলন ঘটানোর জন্য কাজ করে যায়। মানুষের সমাজ ও পরিবারে ফেতনা-ফাসাদ ও বিভেদ-বিসম্বাদ সৃষ্টির জন্য তারা কখনো গোপন চোগলখুরীর নীতি গ্রহণ করে, আবার কখনো প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তারা এক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে অন্যান্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। পক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে তারা সাধারণত নিজের জাতীয়তা বা আত্মীয়তার দিক থেকে নিকটবর্তীদেরকেই বেছে নেয়, যাতে মানুষের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়। এমতাবস্থায় ইহুদী ব্যক্তি যাদের পক্ষ নেবে তারা মনে করবে তাদের সাথে নৈকট্যের কারণেই সমর্থন দিচ্ছে, ফলে তারা তার প্রতি অধিক অনুগত হবে এবং তার প্ররোচনায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অধিক উত্তেজিত হবে। আর সেই ইহুদী ব্যক্তি যাদের বিপক্ষে অবস্থান নেবে, তারাও মনে করবে সে বুঝি প্রতিপক্ষের সাথে নৈকট্য সম্পর্কের কারণেই তাদের পক্ষে বিবাদ করছে, ফলে তার আচরণের প্রতিক্রিয়ায় এরাও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আরো কঠোর হয়ে উঠবে। এক পক্ষের স্বার্থ, সুবিধা-অসুবিধা বা অধিকারের কথা বলে অন্য পক্ষের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করলে কিংবা এক পক্ষের মতামতের সমর্থনে অন্য পক্ষের উপর বাড়াবাড়িপূর্ণ আচরণ করলে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের উপর ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যাবে। এভাবে মানুষের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত তথা ফেতনা-ফাসাদের বিস্তার ঘটবে। মারওয়ান ও ইবনে সাবা এভাবেই হযরত উসমান ও আলী (রাঃ) কে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল, তাঁদেরকে মুসলিম জনগণের অসন্তোষের সম্মুখীন করে তাদের নিয়ে জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। আলী বা উসমান (রাঃ) কেউ তাদেরকে পাত্তা না দিলেও তারা নিজ দায়িত্বেই নিজ নিজ নেতার প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তাঁদের নাম ভাঙ্গিয়ে জনগণের উপর শোষণ-নিপীড়ন চালানোর মাধ্যমে তাঁদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। আজ সেই একই স্টাইলে ইহুদী অনুপ্রবেশকারীরা মানুষের সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করছে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছে। ইহুদীদের কথাবার্তা, কার্যকলাপ ও বিদ্রোহী তৎপরতাকে বাহ্যদৃষ্টিতে নিজের ও অপরের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম বলে মনে হলেও তা আসলে মানুষের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহুদীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয় কারো উপর প্রভাব খাটিয়ে তার দ্বারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করায়, অথবা কারো কোন

নিজস্ব পদক্ষেপকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে পেলে তার সাথে তারা তাল দেয়, সমর্থন জানায় এবং বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে তারা উক্ত পদক্ষেপকেই স্থায়িত্ব প্রদানে ও গতিশীল করে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। তারা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও মন-মেজাজ বুঝে এমনভাবে আচরণ করে থাকে, যাতে কেউ তাদের প্রতি অন্ধ অনুগত হয়ে আবার কেউবা তাদের সাথেই জেদ করে তাদের পারপাস সার্ভ করে দেয়।

উপরোল্লিখিত পদ্ধতি ও কলাকৌশলগুলো অবলম্বন করেই ইহুদীরা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বসহ গোটা বিশ্বকে এক জ্বলন্ত নরককুণ্ডে পরিণত করেছে। তাদের সৃষ্ট ফাসাদের আগুনে পতঙ্গের ন্যায় পতিত হচ্ছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পৃথিবীর মানুষেরা। বিশেষ করে মুসলমানরাই তাদের চক্রান্তের প্রধান শিকার। মুসলমানদের উপর বহিঃশত্রুর আক্রমণ, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে মুনাফিকদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবকিছুর পিছনেই মূল প্ররোচনাদাতা হচ্ছে ইহুদীরা। বিশেষত বর্তমানে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে অমুসলিম পরাশক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণে সমন্বয় সাধনের কাজটি কারা করছে, এই প্রশ্নের জবাবে একটি দলের নামই বেরিয়ে আসবে-- তাহল ইহুদী সম্প্রদায়। কারণ, প্রচারণা, প্ররোচনা ও তদবিরের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মানুষকে কোন ব্যাপারে সংগঠিত করা, কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে রাজি করা বা কাউকে কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত রাখা-- এসব কাজ সম্পন্ন করার মত প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক যোগ্যতা ইহুদী ছাড়া আর কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ইহুদীবাদের এসব কার্যকলাপ নতুন কিছু নয়। তারা আমাদের বহু পুরাতন দুশমন। তারা যেমন অতীতে নবী-রসূলদের হত্যা করেছে, তেমনি হযরত উসমানের (রাঃ) শাহাদাত, উটের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ, কারবালার হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি সকল বেদনাদায়ক ঘটনা সেই ইহুদীদেরই কারসাজির ফসল। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে উত্তেজিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে প্ররোচিত করার কাজটি ইহুদীরা করে আসছে সকল যুগে। মহানবীর (সাঃ) সময় তারা যেমন কবিতা রচনা ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিভিন্ন আরব গোত্রকে উস্কানী দিয়ে মদীনা আক্রমণে প্ররোচিত করেছিল, তেমনি আজও তারা বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকে ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী ক্রুসেডে একই প্লাটফরমে সমবেত করেছে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও হানাহানি সৃষ্টি করা ইহুদী জাতির স্বভাবধর্ম হলেও আল্লাহদ্রোহিতা আর শয়তানী কাজে; জুলুম, অন্যায় আর পাপাচারের কাজে; অশান্তি, বিশৃঙ্খলা আর ফাসাদ সৃষ্টির কাজে মানুষকে পরস্পর সহযোগিতা ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিতে তারা এতটুকু কার্পণ্য করে না। ইহুদী চক্রান্ত এতই জটিল যে, তা ধরতে পারার পরও তা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তাদের ফাঁদ কোথায় কিভাবে পাতা আছে তা দেখতে পেলেও সেই ফাঁদে পা দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তারা আমাদের মাঝে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত সৃষ্টির জন্য কখন কিরূপ পদক্ষেপ নেয় সে সম্পর্কে সময়মত সঠিকভাবে জানার পরও তা এড়ানোর উপায় থাকে না। তারা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখে, যার মাঝে আমাদের বাধ্য হয়েই জড়িয়ে পড়তে হয়। মুসলিম-অমুসলিম সকলেই ইহুদী চক্রান্তের কাছে এতখানি অসহায় যে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদের ফাসাদকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই সকলকে পথ করে দিতে হয়। ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের উপর ইহুদীদের প্রভাব এতই জোরালো যে, তাদের চক্রান্ত ও নাশকতার কথা আগে থেকে জানতে পারলেও তা রোধ করা যায় না, বরং কাজে পরিণত করার সুযোগ দিতে হয়; আর তা সম্পন্ন ও সংঘটিত করে ফেলার পরেও অন্য কারো উপর দোষটা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে বেকসুর খালাস প্রদান করতে হয়। একজন ইহুদী মহিলা যদি একটা বংশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বংশের বড় বড় মুরুব্বীদের মগজ ধোলাই করে নিজের ইসলাম ও মানবতাবিরোধী ফাসাদমূলক কার্যকলাপের অন্ধ সমর্থক বানিয়ে নিতে পারে, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে ম্যানেজ করে ঘরের পরিবেশকে নিজের নিষ্ঠুরতা-বর্বরতা, অশ্লীলতা আর শয়তানী মিশনের জন্য উপযোগী করে নিতে পারে এবং এক্ষেত্রে যেকোন প্রতিবাদী কণ্ঠকে চেষ্টা-তদবির ও লবিংয়ের মাধ্যমে অনায়াসেই স্তব্ধ করিয়ে দিতে পারে, তাহলে শত কোটি মানুষের এই পৃথিবীটা যে কয়েক লাখ ইহুদীর অঙ্গুলি হেলনে নৃত্য করবে, তাদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে, তাদের স্বেচ্ছাচারিতার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে, এতে আর অবাক হবার কী আছে!

ইহুদীরা জন্মগতভাবেই কলহপ্রিয়। তাদের ফেতরাতের মধ্যেই রয়েছে ফাসাদের বীজ। শান্তিতে থাকতে তাদের ভাল লাগে না। মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তাদের অপছন্দ। অকৃতজ্ঞতা আর বিশ্বাসঘাতকতা তাদের মজ্জাগত। মানুষের কাছে যত আনুকূল্য, পৃষ্ঠপোষকতা, সহানুভূতি ও আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করুক না কেন, তারা মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, বিদ্রোহ আর কলহ-বিবাদ ছাড়া আর কিছু উপহার দিতে পারে না। মদীনায় ইহুদীরা রাসূলে করীমের (সাঃ) কাছ থেকে সবরকম নাগরিক অধিকার, মানবিক মর্যাদা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, কিন্তু বিনিময়ে তারা হিংসা-শত্রুতা, অনিষ্ট-নাশকতা আর চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই দিতে পারেনি। তাদের এসব হিংসাত্মক মনোভাব ও অপ্রীতিকর কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে আল-কুরআনে আয়াত নাযিল হয়, "তবে কি তারা আল্লাহ লোকজনকে যা দিয়েছেন সেজন্য ঈর্ষা পোষণ করে? তাদেরকে যদি কিছু দেয়া হতো তাহলে তো তারা অন্যদেরকে কানাকড়িও দিত না।" পরবর্তীকালে তারা ইউরোপের খ্রীস্টানদের কবল থেকে মুসলমানদের কাছে আশ্রয় লাভ করে জীবন রক্ষা করে, কিন্তু প্রতিদানে মুসলমানরাই তাদের শত্রুতার প্রধান শিকারে পরিণত হয়। এমনিভাবে ইহুদীরা যখন যে দেশে যে পরিবারে বসবাস করে, সেখানে তারা আশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধেই ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ উদগীরন করে। যারা তাদেরকে আন্তরিকভাবে আপন করে নিয়ে তাদের সাথে শান্তিতে থাকতে চায়, তাদের জীবনকেও হাত ও জিহবার বিষাক্ত ছোবলের দ্বারা অতিষ্ঠ করে তোলে। তাইতো দেখা যায়, তারা সাময়িকভাবে মানুষের আশ্রয়, সহানুভূতি ও ভালবাসা লাভ করলেও তাদের ঐ সমস্ত আচরণ ও কার্যকলাপের কারণে তারা বেশিদিন কারো সাথে থাকতে পারে না। তারা মদীনায় যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দ্বারা বহিষ্কৃত হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন যুগে তারা মানুষের কাছে বিরক্তি ও ক্রোধের পাত্র হয়ে হত্যাযজ্ঞ ও বিতাড়নের শিকার হয়েছে।

ইহুদীরা অতিশয় চতুর ও ধূর্ত স্বভাবের জাতি। শঠতা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা তাদের বৈশিষ্ট্য। তারা দেখতে শুনতে সহজ-সরল, অবুঝ ও ছেলেমানুষ মনে হলেও আসলে তারা একেকজন গভীর জলের মাছ। কিন্তু তাদের এ সরলতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কুটিলতা মানুষের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। বিশেষ করে তাদের কারো সাথে যখন কোন পরিবার, গোত্র বা সম্প্রদায়ের আত্মীয়তা বা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন সে অনায়াসেই তাদের সবাইকে নিজের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেলে। নিজের মূল পরিচয় গোপন রেখে ধোঁকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে নিজের যাবতীয় মন্দ উদ্দেশ্য তথা কুমতলবগুলো হাসিল করে নেয়। অনেকদিন একত্রে মেলামেশা ও সহাবস্থানের ফলে যখন সকলের মাঝে তার অবস্থান ও প্রভাব সুসংহত ও সুদৃঢ় হয়, তখন তার আসল পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলেও কেউ আর তাকে ফেলে দিতে বা তার প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

ইহুদীরা তাদের ফাসাদ সৃষ্টির কাজ যতটা করে সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে, তার চাইতে অনেক বেশি করে কূটকৌশলের দ্বারা। কাজেই তাদের সাথে কোনপ্রকার যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তি তাদের ফেতনা-ফাসাদ বন্ধে সহায়ক হবে না, বরং ফাসাদের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করবে। কারণ, সামরিক মোকাবেলায় আমরাই অধিক যোগ্যতার অধিকারী, পক্ষান্তরে কূটকৌশলে ওরাই সবচেয়ে অগ্রগামী। যুদ্ধবিরতি কেবল সম্মুখ সমরকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে পারলেও গোপন তৎপরতা চেক দেয়া কোন চুক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। এছাড়া প্রকাশ্য আগ্রাসন ও দমন অভিযানও তারা কখন কিভাবে শুরু করে দেবে সে ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ইহুদীরা অনেক সময় একনাগাড়ে দীর্ঘদিন বাহ্যত শান্তি ও বন্ধুত্বের ভাব বজায় রেখে চলার পর কোন এক

সুবিধাজনক সময়ে হঠাৎ করে বিনা কারণে ঠুনকো অযুহাতে পুনরায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও ঘোলাটে করে তোলে এবং হিংস্র থাবা ও বিষাক্ত দাঁতের ছোবল মারতে শুরু করে দেয়। ইহুদীরা বহুরূপী স্বভাবের প্রাণী। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তাদের ভূমিকা ও আচার-আচরণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। তারা মানুষকে ধোঁকা দেয়া আর মানুষের কাছে আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ও সুযোগ মত খোলস বদলায় এবং বিভিন্ন জনের কাছে নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে তারা ঠিকই নিজেদের আসল চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাদের সেই কুৎসিত ও বীভৎস রূপ যখন আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে, তখন আর করার কিছুই থাকে না। সে সময় আমরা নিজেদেরকেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খুঁজে পাই এবং চারিদিকে চেয়ে দেখতে পাই যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তাদের অনুকূলে চলে গেছে। তখন দেখা যায়, আমার সহযোগী, বন্ধু, বিশ্বস্ত ও আপনজন কেউ আর আমার পাশে নেই। তাদেরকে খুঁজে পাই আমার শত্রুর শিবিরে। শত্রুর মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য করার পরিবর্তে সবাই যেন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে কিংবা আমার দ্বারা শত্রুপক্ষের পারপাস সার্ভ করাতেই উঠেপড়ে লেগেছে। এই হচ্ছে সেই সমস্ত ভুক্তভোগী মুসলিম শাসক, রাজা-বাদশাহ ও নেতাদের আত্মকাহিনী, যারা ইহুদীদের সাথে সংঘাতের পথ ছেড়ে দিয়ে কূটনৈতিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন এবং অবশেষে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজ্য ও রাজত্ব সবই হারিয়েছেন, নিজেকে ও নিজের জাতিকে রক্ষা করতে পারেননি। অতএব, ইহুদীদের ফাসাদমূলক তৎপরতাকে রোধ করতে হলে প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে সামরিক মোকাবেলার মাঝেই ব্যস্ত রাখতে হবে, ক্ষণিকের তরেও ঠাণ্ডা মাথায় চক্রান্ত করার অবকাশ দেয়া চলবে না। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, ইহুদীরা আমাদের সামনে শান্তির মূলো ঝুলিয়ে ধরে আমাদেরকে অশান্তির অক্টোপাসেই ঘিরে ফেলতে চায়। বিভিন্ন সময় সত্য-মিথ্যা নানারূপ আশ্বাস, প্রলোভন, উৎকোচ, সুযোগ-সুবিধা ও সুন্দর ব্যবহারের দ্বারা তারা আমাদেরকে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন ও দোদুল্যমান অবস্থায় ফেলে আমাদের প্রতিরোধ ও তৎপরতাকে থামিয়ে দেয় এবং সেই ফাকে নিজেদের কর্মসূচী ও তৎপরতাকে এগিয়ে নেয়। মাঝেমধ্যে তারা এতটাই সহানুভূতি ও সহনশীলতা দেখায় যাতে আমাদের কাছে প্রতিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রয়োজনীয়তাই নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় বিনাযুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বীন-দুনিয়া সব হাসিল করার নির্বিঘ্ন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে ভেবে আমরা যখন শত্রুতামূলক মনোভাব পরিহার করি, তখনই তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায়। ইহুদীরা অনেক সময় আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য নিজে থেকে কোন ভাল উদ্যোগ বা ভাল প্রস্তাব পেশ করে কিংবা আমাদের উদ্যোগে ইতিবাচক সাড়া দেয়, কিন্তু অন্যত্র তদবির ও দেন-দরবারের মাধ্যমে শুধু সেই ভাল উদ্যোগকেই বানচাল করার ব্যবস্থা করে না, বরং আমাদের ইতিপূর্বে যেটুকু স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুরও অবসান ঘটানোর ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। একটা ব্যাপারে প্রথমে সাময়িকভাবে সহযোগিতা করে পরে সেটাকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়ার বন্দোবস্ত করে। দু'দিনের জন্য পূর্ণমাত্রায় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তারপর সেটা চিরদিনের জন্য কেড়ে নেয়। তারা কোনরূপ শান্তি প্রস্তাব বা ওয়াদা প্রদানের পর অন্য কোন উস্কানিমূলক আচরণের দ্বারা ফাঁদে ফেলে আমাদেরকেই এমন কোন আচরণে লিপ্ত করতে চায়, যার সূত্র ধরে পূর্বে কৃত ওয়াদা বাতিলের একটা সুযোগ পাওয়া যায়। এমনকি আমরা তাদের আচরণের মুখে কোনরূপ বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ও সংযত অবস্থায় থাকলেও অন্য কোন সমস্যা বা অসুবিধার অযুহাত দেখিয়ে আমাদেরকে বিতাড়িত করেই ছাড়বে। তারা যখন কোন অঙ্গীকার প্রদান করে, তখন মনে হয় যেন কোনক্রমেই তা থেকে সরে আসতে পারবে না, লঙ্ঘন করবার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু তারা হয়ত এমন কোন নগণ্য অযুহাতে ভোল পাল্টে বসবে, যা আমাদের কল্পনায়ও আসেনি। হয়তবা আমাদের এমন কোন কাজ বা বিষয়কে সম্পর্কচ্ছেদের অযুহাত বানাবে, যা কিনা তারা নিজেরাই এতদিন উৎসাহ দিয়ে আসছিল। যাদের মাঝে লজ্জা-শরম বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, তাদের পক্ষে খেয়াল-খুশীমত যখন-তখন ওয়াদা দিতে আর ওয়াদা ভাঙতে কোন অযুহাতেরও প্রয়োজন হয় না। আর যদি কোন ওয়াদা পূরণ করেও থাকে, সেক্ষেত্রেও দেখা যায় আমরা যা ভেবে গ্রহণ করি তা তার মধ্যে বর্তমান থাকে না। তারা কোন প্রস্তাব দেয়ার সময় ভেবেচিন্তে হিসাব-নিকাশ করেই দেয়, যা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে অনুকূল মনে হলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা যখন একেকটা লোভনীয় প্রস্তাব দেয়, তখন তা শুনে সমাধান ও মীমাংসার নিশ্চিত সম্ভাবনা মনে হয়; কিন্তু যখন সেটা কার্যকর হয়, তখনই টের পাওয়া যায় সেসব প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত রহস্য। সোজা কথায়, তারা আমাদেরকে সত্য ও শান্তির পথে অগ্রসর হবার সুযোগ খুব বেশি দেবে না, একটা নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত এগোতে দিয়ে তারপর লাঠিচার্জ বা গুলিবর্ষণের দ্বারা ছত্রভঙ্গ করে দেবে। আমরা তাদের যাবতীয় শর্ত, নির্দেশ, আধিপত্য ও আনুগত্য সবকিছু মেনে নিলেও তারা যখন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন বোধ ও সুযোগ লাভ করবে, তখন আবার নতুন কোন শর্ত বা অযুহাত দিয়ে আমাদের উপর ঠিকই চড়াও হবে। হয়ত এমন কোন আবদার পেশ করবে, যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। একজন ইহুদী ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সাথে নরম ব্যবহার করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে তোমাকে ঘায়েল করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে অথবা অন্য কাউকে তোমার মোকাবেলায় দাড় করিয়ে দিতে না পারে। যখন কোনরূপ অসুবিধায় পড়ে, প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়, তখন তোমার সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেও পরিস্থিতি তার অনুকূল হওয়া মাত্রই পুনরায় নিজের আসল চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। ইহুদীদের কাছ থেকে কোন ইতিবাচক প্রস্তাব পেলেই যদি ভাবতে শুরু কর-- শান্তির সুযোগ যখন পেয়েছি, আপাতত গ্রহণ করে নিলে ক্ষতি কি। যদি কোন অসুবিধা হয়, তখন পরে না হয় রুখে দাঁড়ানো যাবে-- তাহলে চিরদিনের জন্যই প্রতারিত হবে। কারণ, তুমি যখন রুখে দাঁড়াতে চাইবে, তখন আর তোমার কোন প্রভাব বা ক্ষমতাই থাকবে না, তোমার ক্ষমতাটুকু তখন তারা এমন কোন পাত্রে স্থানান্তর করে দেবে, তোমার পরিবর্তে এমন কোন বিকল্প নেতৃত্ব দাঁড় করিয়ে দেবে, যার দ্বারা কেবল তাদের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। ফিলিস্তিনে বিপ্লবী মুসলমানদের প্রতিরোধ জিহাদ ও প্রতিবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইহুদীরা ইয়াসির আরাফাতকে ব্যবহার করেছে। তারপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রতারিত হয়েছেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইহুদীদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষীণ চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন, তখনই তাকে গলাধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মাহমুদ আব্বাসকে বরণ করে নেয়া হল। আর এতদিনে ফিলিস্তিনীদের সমর্থনকারী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকেও কোনটাকে ধ্বংস আবার কোনটাকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে এবং ইহুদী ইসরাইলের তদবিরে আরাফাতের প্রতি পশ্চিমা সমর্থনও তুলে নেয়া হয়েছে। ইয়াসির আরাফাতকে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ওয়াদা দিয়ে তাকে আত্মঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণে প্ররোচিত করা হয়েছিল, আর এখন মাহমুদ আব্বাসের সামনেও একই মূলো ঝুলিয়ে ধরে ইহুদীবাদের শিখণ্ডীরূপে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে মাহমুদ আব্বাসের ভাগ্যেও তার পূর্বসুরীর চেয়ে উত্তম কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। যে আরাফাতকে একদা শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল, আজ তিনিই কিনা হয়ে গেলেন শান্তির শত্রু-- শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা! মাহমুদ আব্বাসও যদি ইহুদীবাদীদের চাটুকারিতা আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বিগলিত হয়ে পড়েন, তাকেও ঐ শয়তানেরা কাজ হাসিল হয়ে যাবার পর টয়লেট পেপারের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আসল কথা, তুমি একবার যদি ইহুদী চক্রের আহবানে সাড়া দাও, তাহলে তারা ততদিন পর্যন্ত তোমাকে টিকিয়ে রাখবে, যতদিন তুমি তাদের পারপাস সার্ভ করবে। যখনই তুমি আবার সত্যের পথে ফিরে আসতে চাইবে, স্বজাতি ও স্বজনের মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে, তখনই তোমাকে সরিয়ে দেয়া হবে। তারা মাঝেমধ্যে কিছু বন্দী মুক্তি দিয়ে বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার ভাব প্রদর্শন করলেও এটা মূলত আমাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ সৃষ্টির কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, যেকোন ধরনের তথাকথিত শান্তি প্রক্রিয়াকে পরিহার করে সর্বশক্তি নিয়ে ইহুদীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াটাই তাদের ফাসাদের অনিষ্ট থেকে মুসলিম জাতি ও দুনিয়ার মানুষকে মুক্ত করার একমাত্র পথ।